International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-X, November 2016, Page No. 35-43
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

মৃত্যুশোকাতুর রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অন্তরাত্মার প্রতিক্রিয়া

সুব্রত হালদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

A concept of self-realization was remaining half past in the life of Rabindranath because we can find him with newer period and time. The thirsty human soul had been changing and modifying him by editing and composing new chapters of literature. He is exceptional soul, being ordinary a man that can be known by the hand of the mature and immature deaths of his contemporary familiar or unknown men. World famous poet, he was familiarized with the word death in his long time life (1861-1941). Nobody except him is not known as much as him about the mournful death in their live hood. Time by time he had been losing his intermitted familiar persons, such as wife, sons, friends even his only grand-son. He made console himself even though. Death is the eternal silence among us while death is rebirth in the mind, memory and creativity toward him. He represents the death in various formations in his literature but the deep – grief remains unknown towards the readers. He learns as to overcome the depression of death. According to him death is the freedom of life. It can be applied in life by losing of blood. He achieved the way of the death, hence he learns as the eternal idealism toward us with the association of soul.

Key Words: Self-realization, thirsty human soul, mourns eternal silence, rebirth, and deep-grief.

সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথ জীবনের অর্ধ সময়ের বেশি ছিল এক আত্মপ্রত্যয়ের অধ্যায়। কারণ এই বিশেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই বারংবার নররূপে নব কলেবরে। চির অতৃপ্ত এ মানবত্মটি এই সময় নিজেকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন, সাহিত্যের নব নব অধ্যায় সংযোজনের মাধ্যমে। সাধারণ মানুষ হয়েও তিনি যে ব্যতিক্রমী আত্মা, তার পরিচয় পাই তার জীবনের সঙ্গে সাঙ্গিকৃত চেনা-জানা মানুষগুলির মৃত্যুর, অকালমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। সাধারণ মানুষের কাছে মৃত্যু যেখানে স্তব্ধতার গতিহীনতার বার্তা দেয়, রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যু যেন বারবার বাঁচা, স্মৃতিতে হৃদয়ে বাঁচা অর্থাৎ সৃষ্টিশীলতায় বাঁচা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনকালে (১৮৬১-১৯৪১) 'মৃত্যু' নামক শব্দটির সঙ্গে গভীর পরিচয় ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে শুধুমাত্র দূর বা কাছ থেকে উপলব্ধি করেননি। আবার মৃত্যুকে কোনো ভাব সত্তার দ্বারা কখনও কল্পনায় গড়ে তোলেননি। তাঁর জীবনে মৃত্যুর বাস্তব অভিজ্ঞতা ঘটেছে অনেকবার। তাঁর মৃত্যু অভিজ্ঞতা ঘটেছে, পারিবারিক বন্ধনে তো বটেই, আবার কখনও পরিবারের বাইরে প্রিয়জনের মৃত্যুর দ্বারা।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে পারিবারিক, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়বন্ধুর মৃত্যু অভিজ্ঞতাগুলি তুলে ধরা হল—

- মাতা সারদা দেবীর মৃত্যু (১৮৭৫ খ্রিঃ)।
- গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র (১৮৮১ খ্রিঃ)।
- সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, জামাইবাবু, রবীন্দ্রনাথের বিয়ের রাতে মারা যান (১৮৮৩ খ্রিঃ)।
- দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী অর্থাৎ বৌদি কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা (১৮৮৪ খ্রিঃ)।
- সেজদা হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যু (৫ই জুন ১৮৮৪ খ্রিঃ)।
- বিহারীলাল চক্রবর্তী, আদর্শ কবি, মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের বেয়াই (১৮৯৪ খ্রিঃ)।
- সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভগ্নিপতি, ক্যান্সারে মারা যান (১৮৯৭ খ্রিঃ)।
- ঊষাবতী চট্টোপাধ্যায়, ভ্রাতুষ্পুত্রী (১৮৯৯ খ্রিঃ)।
- ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু (১৮৯৯ খ্রিঃ)।
- নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র (১৯০১ খ্রিঃ)।
- স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু (১৯০২ খ্রিঃ)।
- বিমানেন্দ্রনাথ রায়, বাবার শ্যালকের ছেলে (১৯০৩ খ্রিঃ)।
- মধ্যমা কন্যা রেণুকার মৃত্যু (১৯০৩ খ্রিঃ)।
- পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু (১৯০৫ খ্রিঃ)।
- কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু (১৯০৭ খ্রিঃ)।
- মধ্যম জামাতা সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মৃত্যু (১৯০৮ খ্রিঃ)।
- হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র (১৯০৮ খ্রিঃ)।
- নীপময়ী ঠাকুর, বৌদি (১৯১০ খ্রিঃ)।
- জানকীনাথ ঘোষাল, ভগ্নিপতি, 'ভারতী'র সম্পাদক (১৯১৩ খ্রিঃ)।
- বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা (১৯১৫ খ্রিঃ)।
- শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগ্নের মেয়ে (১৯১৬ খ্রিঃ)।
- ইরাবতী মুখোপাধ্যায়, ভাগ্নি (১৯১৮ খ্রিঃ)।
- মাধুরীলতা চক্রবর্তী, জ্যেষ্ঠকন্যা, যক্ষায় মারা যান (১৯১৮ খ্রিঃ)।
- জ্যোতিঃপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, দাদার মেয়ের ছেলে, শৈশবে কবিতার দীক্ষাদাতা (১৯১৯ খ্রিঃ)।
- সুকেশী ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্রের স্ত্রী (১৯১৯ খ্রিঃ)।
- সৌদামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, দিদি (১৯২০ খ্রিঃ)।
- তিভাসুন্দরী চৌধুরী, ভাগ্নি (১৯২২ খ্রিঃ)।
- সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা (১৯২২ খ্রিঃ)।
- সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দাদা (১৯২৩ খ্রিঃ)।
- আশুতোষ চৌধুরী, ভাগ্নির স্বামী (১৯২৪ খ্রিঃ)।
- বিনয়িনী চট্টোপাধ্যায়, বেয়ান, পুত্র রথীন্দ্রের শাশুড়ি (১৯২৪ খ্রিঃ)।
- হিরণ্ময়ী মুখোপাধ্যায়, ভ্রাতুষ্পুত্রী (১৯২৫ খ্রিঃ)।
- জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নতুন দাদা (১৯২৫ খ্রিঃ)।
- দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বড়দাদা (১৯২৬ খ্রিঃ)।
- অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র (১৯২৯ খ্রিঃ)।

- মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথের জামাতা (১৯২৯ খ্রিঃ)।
- সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র (১৯২৯ খ্রিঃ)।
- কন্যা মীরাদেবীর পুত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যু (১৯৩২ খ্রিঃ)।
- সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, ভাগ্নে (১৯৩৩ খ্রিঃ)।
- কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র (১৯৩৫ খ্রিঃ)।
- দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র (১৯৩৫ খ্রিঃ)।
- ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতুষ্পুত্র (১৯৩৭ খ্রিঃ)।
- গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাকার ছেলে (১৯৩৮ খ্রিঃ)।
- প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু (১৯৪০ খ্রিঃ)।

এছাড়াও অনেক অনাত্মীয় প্রিয়জনের মৃত্যুশোক তাঁকে বহন করতে হয়েছিল। সেগুলি নিম্নে দেওয়া হল-

- শান্তিনিকেতনের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যু (১৯০৪ খ্রিঃ)।
- কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু (১৯২২ খ্রিঃ)
- পুত্রতুল্য সন্তোষচন্দ্রের অকালমৃত্যু (১৯২৬ খ্রিঃ)।
- প্রিয়পাত্রী উমা দেবীর মৃত্যু (১৯৩১ খ্রিঃ)।
- স্নেহপাত্রী রমাদেবীর মৃত্যু (১৯৩৫ খ্রিঃ)।

এসব মৃত্যুশোক রবীন্দ্রনাথের জীবনে নানারূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। এ প্রতিক্রিয়াগুলি তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যধারায় ফুঁটিয়ে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মায়ের মৃত্যু হয় ১০ই মার্চ ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ১৪ বছর। মায়ের মৃত্যু তিনি স্বচক্ষে দেখতে পাননি, তখন তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে মার মৃত্যু সংবাদ শুনলেন। তখন সে কথার অর্থ ভালো করে বুঝতে পারেননি। ঘরের বাইরের বারান্দায় এসে দেখলেন, মা সুসজ্জিত হয়ে খাটের উপর শুয়ে আছেন। কিন্তু মৃত্যুর ভয়ংকর রূপ সম্পর্কে তার কোনো অনুভূতি ছিল না। মায়ের মৃত্যু রূপটিকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল 'সুখতৃপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর'। কিন্তু মায়ের শ্মশান যাত্রার সময় তাঁর মনে হঠাৎ শোক অনুভব ঘটেছিল মায়ের মৃত্যুশোক তাঁর জীবনে দীর্ঘস্থায়ীভাবে ছায়া ফেলতে পারেনি। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বলেছেন-

> *"মা -এর যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প... যে ক্ষতি পূরণ হইবে না,যে বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ; শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না। এই জন্য জীবনে প্রথম যে মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দ পদে চলিয়া গেল"। (জীবন স্মৃতি,* মৃত্যুশোক)

বাল্যকাল থেকে কবির সঙ্গে মায়ের যোগসাধন তেমনভাবে ঘটেনি। তাই একটি প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধ ও অভিমান রবীন্দ্রনাথের ছিল। পরিণত বয়সে কখনও কখনও সেই অভিমানসুর প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলতেন-

> *"মা যে কী জিনিস তা জানলুম কই আর! তাই তো তিনি আমার সাহিত্যে স্থান*

পেলেন না। আমার বড়দিদি আমাকে মানুষ করেছেন"।[১]

মায়ের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথসহ সকল বালকদের মায়ের অভাব ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা অনেকেই করেছিলেন বিশেষভাবে যার কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন বাড়ির কনিষ্ঠাবধূ কাদম্বরী দেবীর প্রসঙ্গে বলেছেন-

"তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া, সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যেকোনো অভাব ঘটিয়াছে তা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন"। (জীবন স্মৃতি, মৃত্যুশোক)

মায়ের মৃত্যুর ১০ বছর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ২৪ বছর বয়সে আকস্মিক তাঁর মাতৃরূপী নতুন বৌদি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেন (১৯ শে এপ্রিল ১৮৮৭ খ্রিঃ)। মায়ের মৃত্যুর মতো এ মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মেনে নিতে পারেননি। এ মৃত্যু যেন খুবই নিষ্ঠুর কবির কল্পনার রঙিন জীবনাকাশের উপরই মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এসেছিল। বৌদির মৃত্যুবেদনা কবিহৃদয়ে সুতীব্রভাবে বেজে উঠেছিল। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন-

"আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশু বয়সের লঘুজীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়, কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অতসহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল"। (জীবন স্মৃতি, মৃত্যুশোক)

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোক রবীন্দ্রনাথের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন তা ভুলতে পারেননি। প্রখ্যাত রবীন্দ্র সমালোচক অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য্য বলেছেন-

"রবীন্দ্র জীবনের তীব্রতম, মহত্তম দুঃখ, রূপে অভিহিত করেছেন"।[২]

রবীন্দ্রনাথের অন্তরের গভীরে বৌদির মৃত্যুবেদনা নিয়তই বেজে চলেছে। কোনো কিছুকে ভুলে থাকা আর একেবারে ভুলে যাওয়া এক বিষয় নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

"ভুলে থাকা, নয় যে তা ভোলা;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা"।(বলাকা-৬, এলাহাবাদ, ৩রা কার্তিক, ১৩২১)

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর বছরেই রবীন্দ্রনাথের সেজদা হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় (৫ই ১৮৮৪ খ্রিঃ)। এর ১৫ বছর পরে ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যু হয় (২২ শে আগস্ট ১৮৯৯)। বলেন্দ্রনাথ কবির খুব স্নেহের পাত্র ছিলেন এবং তাঁকে তিনি বলু বলে ডাকতেন। তাই এই মৃত্যু কবিকে গভীরভাবে শোকাসন্ন করেছিল। এ সম্পর্কে বন্ধুবর প্রিয়নাথ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির উল্লেখ করা হল-

"ভাই
বলুর মৃত্যু হইয়াছে।
কলিকাতায় থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। বিশেষতঃ আমার স্ত্রী শিলাইদহে অত্যন্ত শোক অনুভব করিতেছেন, বলুর প্রতি তাহার একান্ত স্নেহ ছিল"। (চিঠিপত্র, অষ্টম খণ্ড)

কবি রবীন্দ্রনাথের ৪১ বছর বয়সে পূর্ণমাত্রায় মৃত্যুশোক জনিত যন্ত্রণাটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, যখন তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয় (২৩ শে নভেম্বর ১৯০২ খ্রিঃ)। তখন মৃণালিনী দেবীর বয়স মাত্র ২৯ বছর। স্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে কবি ভীষণভাবে শোকাহত হয়েছিলেন। কবির পত্নী প্রেম খুবই নিবিড় ছিল এবং পত্নীর মৃত্যুশোক কবি হৃদয়ে গভীরভাবে বেজেছিল। তা একটি লেখার সাহায্যে উল্লেখ করা হল-

"শিলাইদহের অনেকে বলেন যে, স্ত্রী বিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথকে এখানকার সবাই সন্ন্যাসীর বেশেই দেখতেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তরের শোক কোনদিনই বাইরে প্রকাশ পায়নি। সেকালকার পুরানো কর্মচারীরা বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী বিয়োগের পর থেকে শিলাইদহ কুঁঠিবাড়িতে থাকতেন না, - তাঁর বোটেই বাস করতেন, নিতান্ত কোনো উপলক্ষ্য না হলে কুঁঠিবাড়িতে যেতেন না"।[৩]

স্ত্রীর অকালমৃত্যুতে যেমন শোকাহত হয়েছিলেন, তেমনি এই শোকের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তিনি লিখেছিলেন 'স্মরণকাব্য' (১৯০২-০৩ খ্রিঃ)। এ কাব্যের একটি কবিতায় তিনি লেখেন-

"এ সংসারে একদিন নববধূ বেশে
তুমি যে আমার পাশে দাঁড়াইলে এসে,
রাখিলে আমার হাতে কম্পমান হাত,
সেকি অদৃষ্টের খেলা, সেকি অদৃষ্টের খেলা, সেকি অকস্মাৎ?
শুধু এক মুহূর্তের এ নহে ঘটনা
অনাদিকালের এই আছিল যন্ত্রনা"। (স্মরণ-১৫, শান্তিনিকেতন, ২রা পৌষ, ১৩০৯)

কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ বন্ধুর সঙ্গে মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে সে কলেরা রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায় (২৩ শে নভেম্বর ১৯০৭)। তখন তার বয়স হয়েছিল মাত্র ১২ বছর। কনিষ্ঠও প্রিয়পুত্র শমীর মৃত্যু কবির মনকে শোকার্ত করেছিল। কারণটা স্পষ্ট পিতা হিসাবে তাঁর প্রথম এই মৃত্যুশোক । অনেকদিন পরে একটি চিঠিতে সেই সময়ের অনুভূতির কথা বলেছিলেন-

"শমী যে রাত্রে চলে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়ছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে, কম পড়েনি সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে"। (চিঠিপত্র, চতুর্থ খণ্ড)

জ্যেষ্ঠাকন্যা মাধুরীলতার (বেলা) মৃত্যু (১৬ই মে ১৯১৮ খ্রিঃ) কবি জীবনে প্রবলভাবে আঘাত করেছিল। কিন্তু একের পর এক মৃত্যুশোক তাঁকে পাথরে পরিণত করেছিল। তাই সে আঘাত সংযমের সহিত তিনি গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয়কন্যা ছিলেন বেলা। বেলার মৃত্যুর আগে শান্তিনিকেতন থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে চিঠিতে কবি লেখেন-

"জানি, বেলার যাবার সময় হয়েচে। আমি গিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। এখানে আমি জীবন-মৃত্যুর উপরে মনকে রাখতে পারি, কিন্তু কলকাতায় সে আশ্রয় নেই। আমি এইখান থেকে বেলার জন্যে যাত্রাকালের কল্যাণ কামনা করচি। জানি আমার আর কিছু করবার নেই"। (চিঠিপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড)

কবির বড় মেয়ে বেলার মৃত্যুশোকের প্রতিক্রিয়ায় একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি হল-

"এই সদা শুনি, 'গেছে চলে', 'গেছে চলে'।
তবু রাখি বলে
বলোনা, 'সে নাই'।
সে কথাটা মিথ্যা, তাই
কিছুতেই সহে না যে
মর্মে গিয়ে বাজে"। (পলাতকা, শেষ প্রতিষ্ঠা)

কবি এই কবিতার মাধ্যমে বলেছেন- যাওয়া আর আসা, আছে আর নাই বিচ্ছিন্নভাবে এটা জীবনের ভগ্নরূপ, দুটির মিলনে জীবনের সম্পূর্ণতা।

কন্যা মীরাদেবীর পুত্র নীতিন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় (৭ই আগস্ট ১৯৩২)। সে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে জার্মানিতে ক্ষয়রোগে মারা যায়। নীতু ছিল কবির একমাত্র আদরের দৌহিত্র। প্রিয়জনের একের পর এক অকাল মৃত্যুর আঘাত কবির অসীম ধৈর্যের সহিত গ্রহণ করেছেন। কন্যা মীরাদেবীকে পুত্রের মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিয়ে কবি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন। সেই চিঠির অংশ বিশেষ তুলে ধরা হল-

"যে রাত্রে শমী গিয়েছিল সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম বিরাট
বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও যেন
পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা যখন শুনলুম তখন
অনেকদিন ধরে বারবার করে বলেচি, আর তো আমার কোনো কর্তব্য
নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি
সেখানে কল্যান হোক"। (চিঠিপত্র, চতুর্থ খণ্ড)

কবির অত্যন্ত প্রিয় নাতি নীতুর মৃত্যু শোকের প্রতিক্রিয়াও একটি কবিতায় পাওয়া যায়। কবিতাটি হল-

"দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি
লজ্জা দিয়ো না।
সকলের নয় যে আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।...
অতি বৃহৎ বিশ্ব,
অম্লান তার মহিমা,
অক্ষুব্ধতার প্রকৃতি; ..." (পুনশ্চ, বিশ্বলোক)

মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় (৩রা মে ১৯৪০)। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্রের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁর বয়স ৭৯ বছর। সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় যেদিন, সেই দিনটি কবির জন্ম দিনের উৎসব ছিল। উৎসবের পরদিন সকালে তিনি দুঃসংবাদটি শুনেছিলেন। সেদিন বিকেল বেলাতে একটি অসামান্য কবিতা লেখে। কবিতাটি হল-

"আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয়মৃত্যু বিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ;
আপন আগুনে শোকদগ্ধ করি দিল আপনারে
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে।

সায়াহ্নবেলার ভালে অস্তসূর্য দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা,
স্বর্ণময়ী করে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখশ্রীরে,
তেমনি জ্বলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিমসীমায়"। (জন্মদিনে-৮)

ইতিপূর্বে নাট্যকার ও বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর কথা এবং কিভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের মধ্যে করুণ রসের সঞ্চার করে মহিমান্বিত করে তুলেছেন তার সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। পারিবারিক মৃত্যু ছাড়াও পরিবার বহির্ভূত বা অনাত্মীয়দের মৃত্যুর প্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে তার প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হল।

রবীন্দ্রনাথের খুবই স্নেহপাত্র, সেযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। মাত্র চল্লিশ (৪০) বছর বয়সে তাঁর অকালপ্রয়াণ ঘটে (১৯২২)। কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতিকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটির নামকরণ করেন, তাঁরই নামানুসারে 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত'। তাঁর স্মৃতি সভায় রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি পাঠ করেছিলেন। নিম্নে কবিতাটির অংশ বিশেষ তুলে ধরা হল-

"যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা কতবার তারি সারি গানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুনঃ আজ তার সাথে দেখা
মেঘ-ভরা বৃষ্টিভরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি
ঝড়ে পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধিলিপিখানি
তব শেষ বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আমি, ওই খেয়া' পরে করি ডর..." (পূরবী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। তাঁদের পুত্রদ্বয় হলেন সন্তোষচন্দ্র ও রথীন্দ্রনাথ তাঁরা দুজনে সহপাঠী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তাঁরা কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকা যান। সন্তোষচন্দ্র টাইফয়েডে রোগাক্রান্ত হয়ে মাত্র চল্লিশ (৪০) বছর বয়সে কলকাতায় মারা যান (১৯২৬)। তখন কবি দেশের বাইরে ছিলেন। কিন্তু পুত্রতুল্য সন্তোষের অকাল মৃত্যুর খবএ শুনে একটি পত্রে লিখেছিলেন-

"কাল সুয়েজে এসে খবর পেলুম যে সন্তোষ মারা গেছে।... আমি আছি অথচ
আর যে একজন আমার সঙ্গে একান্ত মিলিত ছিল সে একেবারেই নেই, এমন
বিরুদ্ধকথা ঠিকমত মনে করাই শক্ত"। (পথে ও পথের প্রান্তে-৩)

অধ্যাপক মোহিতকুমার সেনের কন্যা উমাদেবীর (বুলা) নিতান্ত অল্প বয়সে মৃত্যু হয় (১৯৩১)। ছোটবেলা থেকেই বুলার মধ্যে কবিত্ব সত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। কবির হৃদয়ে গভীর বেদনাবোধ জন্মেছিল। ফল স্বরূপ বুলার শোকাহত বন্ধু মৈত্রেয়ী দেবীকে কবি একটি স্বান্ত্বনা জানিয়েছিলেন। তা হল-

"বুলা একে বারেই নেই এই কথাটা যখন তোমার মন কোন মতেই
স্বীকার করতে চাচ্ছেনা তখন তাকে স্বীকার করার দরকার কী? থাকা
ব্যাপারটার কত বৈচিত্রই আছে।..."[৪]

বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা ও পরম স্নেহপাত্রী রমা দেবীর (নুটু) মৃত্যু উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লেখেন তার অংশ বিশেষ হল-

"ফাল্গুনের পূর্ণিমার আমন্ত্রণ পল্লবে পল্লবে
এখনি মুখর হল অধীর মর্মর কলরবে।...
এবার দক্ষিণ বায়ু দুঃখের নিশ্বাস এল বয়ে,
তুমি তো এলেনা ফিরে; এ আশ্রম তোমার বিরহে
বীথিকার ছায়ায় আলোকে
সুগভীর পরিব্যাপ্ত শোকে..."। (বীথিকা, নুটু)

কবি রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ জীবনে পারিবারিক পরিজন ও বিভিন্ন আত্মীয়সজনের মৃত্যুর বেদনায় বিহ্বল হয়েছেন। বলা যায় যে, প্রথম দিককার মৃত্যুতে কবির শোকার্ত অনুভূতি গভীর বেদনার সহিত প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি মৃত্যুশোককে সংযম করে মনবেদনা প্রকাশ করেছিলেন। আপন অন্তরের মধ্যে মৃত্যুশোককে গুপ্ত রেখে নিরাসক্তভাবে নিজের কাজ করেছেন। মৃত্যু প্রসঙ্গটির পরিণত উপলব্ধি এবং তাঁর আত্মমগ্ন ব্যক্তিত্ব স্বভাবের মধ্যে নিরাসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করেছেন-

"তিনি (রবীন্দ্রনাথ) কখনও নিজের দুঃখশোক কাহারও কাছে প্রকাশ
করেন না, অতি বেদনার সময়ে তাঁহাকে কর্মে রত দেখিয়াছি। তাঁহার
বেদনাকে তিনি অন্যের কাছে বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিয়া বেদনার গুরুত্বকে
হ্রাস করিতে চাহেন না"। [৫]

তথ্যসূত্র:

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঘরোয়া, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ৭০০০১৭, গ্রন্থসূচনার অংশবিশেষ, ১৯৭৫
২। জগদীশ ভট্টাচার্য, কবিমানসী (প্রথম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৯৬
৩। শ্রী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, দেবী মৃনালিনী, বিশ্বনাথ দে সংকলিত, রবীন্দ্রস্মৃতি, প্রথম সংস্করণ, পৃ.১৫০
৪। মৈত্রেয়ী দেবী, 'স্বর্গের কাছাকাছি' প্রকাশ ১৯৮১, পৃ. ১৪৩
৫। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী (প্রথম খণ্ড), তদেব, ষষ্ঠসংস্করণ, ভাদ্র ১৪১৭, পৃ.৯৫

সহায়ক গ্রন্থ:

১। ধীরেন্দ্র দেবনাথ, 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু', তৃতীয় সংস্করণ ২৫ বৈশাখ, ১৪০৭, ৮ মে ২০০০, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৬এ.বি.টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫০
২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী' (প্রথম খণ্ড), ষষ্ঠসংস্করণ ভাদ্র, ১৪১৭, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৭
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (১ম ও ৮ষ্ট খণ্ড), পুর্নমুদ্রণ পৌষ ১৪১০, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, রোড, কলকাতা-৭০০০১৭

পত্র-পত্রিকা:

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র' (অষ্টম খণ্ড), সংস্করণ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৭

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র' (চতুর্থ খণ্ড), সংস্করণ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৭

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র' (দ্বিতীয় খণ্ড), সংস্করণ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-৭০০০১৭

৪। আনন্দবাজার পত্রিকা, 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু', ২০১৬